দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 APR 1993 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা-অশিক্ষার কড়চা

অনিরুদ্ধ

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নানা কারণে বিপর্যয়ের মুখোমুখি। মোটা দাগে এর তিনটি কারণ উল্লেখ করা চলে। প্রথমটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস। যার জন্য প্রধানতঃ রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়ী করা হয়। দ্বিতীয়টিঃ ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বিষয়টি। তৃতীয়টিঃ শিক্ষাদান পদ্ধতি যার সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রথমটি নিয়ে বিতর্ক চলছে রাজনৈতিক পর্যায়ে। সেখানে রাজনৈতিক পক্ষাপক্ষের হেতু ব্যাপারটি ক্রমাগত জটিল ও অমীমাংসিত রয়েছে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা কেউ কেউ বলেছেন। আর এর তীব্র বিরোধিতা করেছে ছাত্ররা এবং রাজনীতিকরাও। এখানে সে বিতর্ক নয়। ইংরেজী শিক্ষা ডিগ্রী পর্যায়ে উঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। যুক্তি ছিল ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার পথে এটা নাকি বাধা। কারণ, ছাত্ররা ইংরেজীতে ফেল করে। তারপর দেখা গেল ছাত্ররা ইংরেজীও শিখছে না বাংলাতেও ভাল করছে না। ফলে উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান কার্যতঃ তাদের অনায়ত্ত থাকে মুখস্থ বিদ্যার পরিধির বাইরে। আর বাংলার মাধ্যমে অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বাংলায় উপযুক্ত বই লেখা হয়নি। ফলে শিক্ষাদান যাই হোক শিক্ষা গ্রহণ যথাযথ হয় না। দীর্ঘদিন পর ডিগ্রী পর্যায়ে আবার ইংরেজী চালুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে ইংরেজী শিক্ষিত কিছু বুদ্ধিজীবী সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ত্বরিৎ তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সে আলোচনাও এখানে নয়।

এখন আসে পরীক্ষা পদ্ধতির বিষয়টি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেল বহু ছাত্রের একটা শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়েছে। অনেক ছাত্র সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছে। অনেকে দেশের ভিতরে গ্রামে-গ্রামান্তরে হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে ব্লিজার্ডে তাড়া-খাওয়া পাখির মত অবস্থায় কোনমতে প্রাণরক্ষা করেছে। অনেকে উদ্বাস্তু হয়ে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

তাদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটা নিয়ে সরকার সমস্যায় পড়লো। যুদ্ধশেষে পাওনাকে সহজ করা হল। অর্থাৎ পাস করার ব্যবস্থাটা করা হল ঢালাওভাবে। যুদ্ধের পুরস্কারস্বরূপ নকল করার মধ্যে বিবেকের দংশন আমরা কেউ অনুভব করলাম না। অন্যায়ের এই ছিদ্রপথে প্রবেশ করল শনি। বছরের পর বছর নকল বেড়ে চলতে লাগল। অবস্থাটা দুঃসহ হয়ে উঠল। কিছু অভিভাবক, কিছু শিক্ষক আর প্রশাসন ক্রমান্বয়ে জড়িয়ে পড়ল এই অন্যায়ের জালে। এ থেকে বেরুবার পথের কথা [illegible]। এদিকে ক্রমান্বয়ে স্কুল কলেজ ও [illegible] শিক্ষাদানের ব্যাপারটাও উপেক্ষিত [illegible] ব্যবসায়ে পরিণত হল। [illegible] অধিক গৃহশিক্ষক না হলে [illegible] হয়ে উঠতে থাকে। [illegible] রাজত্ব। নিষ্ঠাবান [illegible] লাঞ্ছিত হন। প্রশাসন [illegible] বিকার। যেটুকু আইন [illegible] করে তাতে হিতে [illegible] দাবিতে প্রকাশ্য মিছিল

শিক্ষার কর্ণধারগণ প্রমাদ গুণলেন। তারা তাকালেন বাইরের দিকে। আর এদিকে জনপ্রিয় শ্লোগান হলো ঔপনিবেশিক পরীক্ষা পদ্ধতি বদলাও, শিক্ষাপদ্ধতি বদলাও। এসব ফাঁপা শ্লোগান খুব মনঃপূত। বেশ একটা বিপ্লবী ভাব থাকে। সুতরাং এলো নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি। নকলপ্রবণতা বন্ধ করার জন্য শিক্ষার গোড়াটা কেটে ফেলার ব্যবস্থা করা হল। ৫০০ প্রশ্ন ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিবে। আর বাকি ৫০ নম্বর রচনামূলক। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট নম্বর মিলিয়ে পাস করতে হবে। পরে চাপের মুখে (অবশ্যই ছাত্রদের) স্থির হল মোট ৩৩ নম্বর পেলেই পাস।

এর ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন বিঘ্নিত হল। ব্যাহত হল মনুষ্যত্বের বিকাশ। মাঝখানে অবশ্য নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক দুই অংশেই পাস নম্বর থাকতে হবে স্থির করা হয়েছিল। ছাত্রদের বিরোধিতার মুখে তা পরিত্যক্ত হল। ফলে দেখা গেল আকাশের সব তারা দিনের আলোর গভীর ছেড়ে ঘরে ঘরে হাজির। মাটিতে তারার এই গড়াগড়ি দেখে শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার সবাই উদ্বিগ্ন। সুতরাং আবার মন্ত্রণাসভা বসল কী করা যায়। এদিকে শিক্ষাবর্ষ এগিয়ে চলল। সুতরাং স্থির হল নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পৃথকভাবে ও রচনামূলক পদ্ধতিতে পৃথকভাবে পাস করতে হবে এবং এ পদ্ধতি '৯৬ সাল থেকে চালু হবে। আর ৫০০ প্রশ্ন ব্যাঙ্ক শিক্ষকদের প্রশ্ন করার গাইড (নির্দেশিকা) হিসেবে কাজ করবে তা থেকে প্রশ্ন করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

অর্থাৎ শুধু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন মুখস্থ করলেই পরীক্ষা বৈতরণী পার হওয়া যাবে।

এর ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন বিঘ্নিত হল। ব্যাহত হল মনুষ্যত্বের বিকাশ। মাঝখানে অবশ্য নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক দুই অংশেই পাস নম্বর থাকতে হবে স্থির করা হয়েছিল। ছাত্রদের বিরোধিতার মুখে তা পরিত্যক্ত হল। ফলে দেখা গেল আকাশের সব তারা দিনের আলোর গভীর ছেড়ে ঘরে ঘরে হাজির। মাটিতে তারার এই গড়াগড়ি দেখে শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার সবাই উদ্বিগ্ন। সুতরাং আবার মন্ত্রণাসভা বসল কী করা যায়। এদিকে শিক্ষাবর্ষ এগিয়ে চলল। সুতরাং স্থির হল নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পৃথকভাবে ও রচনামূলক পদ্ধতিতে পৃথকভাবে পাস করতে হবে এবং এ পদ্ধতি '৯৬ সাল থেকে চালু হবে। আর ৫০০ প্রশ্ন ব্যাঙ্ক শিক্ষকদের প্রশ্ন করার গাইড (নির্দেশিকা) হিসেবে কাজ করবে তা থেকে প্রশ্ন করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সহজ পাসের পদ্ধতিটা এভাবে সংশোধন করা হল। কিন্তু এভাবে চার বছর (আগামী দু'বছর ধরে) ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা বিপর্যয় চলতে থাকবে। যারা এই অপরিপক্ক জ্ঞান আর মুখস্থ বিদ্যার নম্বরের বোঝা নিয়ে গেল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের গোড়াটা শক্ত হলো না। অবশ্য ব্যতিক্রমধর্মী ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এ ব্যবস্থায়ও যারা জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানার্জনের ধারাকে বিসর্জন দেয় নাই তাদের সাধারণভাবে চিহ্নিত করা দুষ্কর। এই যে শিক্ষা নিয়ে চার বছর শিক্ষার্থীদের ওপর গিনিপিগের মত পরীক্ষা চালানোর ব্যবস্থা বহাল রইল, তার মাশুল কে দিবে।

অথচ এ দেশেই শিক্ষক হিসেবে আমরা পেয়েছিলাম ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ারকে। আসলে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যে ফাঁকি- যা নকলপ্রবণতার সূচনা করেছে; অভিভাবকদের সায় আর শিক্ষকদের কর্তব্যপালনে শৈথিল্য এর জন্য অনেকটা দায়ী তা আমরা স্বীকার করতে নারাজ।

শুধু পরীক্ষা পদ্ধতি বদল করে ছাত্রছাত্রীর শিক্ষালাভের পথ সুগম হবে না। ক্লাসে শিক্ষাদানের উপর নজর দিতে হবে। ক্লাসে শিক্ষকরা (বেশির ভাগ) পড়ান না। তারা গৃহশিক্ষকতার শ্রান্তি নিরসন করতে ক্লাসে আসেন। আর ছাত্ররা এক একজন কমপক্ষে ৪ থেকে ৮ জন গৃহশিক্ষক রেখে পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়। শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলেন যে, আমার কাছে না পড়লে 'লেটার' পাবে না। প্রশ্নপত্র কোথাও ফাঁস হয় পরীক্ষার আগে কোন কোন বোর্ডে। আবার অনেক শিক্ষকই নানাভাবে প্রশ্ন কী আসবে তা জেনে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দেন। মোটা অঙ্কের বিনিময়ে গৃহশিক্ষকতার আড়ালে। এরকমও দেখা গেছে সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে রটিয়ে দেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। আর ছাত্রছাত্রীরা (যাদের সঙ্গতি আছে) তা হাজার, দু'হাজার, তিন হাজার টাকায় কিনে নেয়। পরে দেখতে পায় যে, পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। সুতরাং ব্যাপারটা চেপেচাপে যায়। খবরের কাগজে সংবাদ হয় না। এই অন্তঃশীলা দুর্নীতি আজ শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াটা দুর্বল করে দিচ্ছে ক্রমাগত। যাদের অধিক সঙ্গতি আছে তারা প্রথম সুযোগেই বিদেশে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠান। অবশ্য জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ সম্পর্কে যারা এখনও শিক্ষাকে মূলধন মনে করেন এমন সচ্ছল অভিভাবক। অন্যেরা নয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উপকারিতা সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষাপদ্ধতির সঠিক ধারাটা যদি প্রথম থেকে চালু করা হত তবে এরকম বিপত্তি দেখা দিত না। প্রথমতঃ কোন নির্দিষ্ট প্রশ্নব্যাঙ্ক রাখা নৈর্ব্যক্তিক শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ নয়। আমাদের উর্বর মস্তিষ্ক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ বা তাদের সুহৃদরা এটা চালু করলেন। দ্বিতীয়তঃ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ভুল স্থানে টিক চিহ্ন দিলে অতিরিক্ত ১ নম্বর কাটা হবে। যাকে বলা চলে negative mark প্রদান। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি যে সব বিষয়ে শিক্ষা এদেশে চালু আছে সেখানে এই বিধান অনুসরণ করা হয়। এটা শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল দেয়। তা অনুসরণ করা হল না। অনেকে বলবেন যে, এখন ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তক পড়তে আগ্রহী হবে। নকলপ্রবণতা কমবে। কিন্তু গত দু'বছরে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ছাত্রদের নকলপ্রবণতা কমেছে কী? নকলের জন্য কী ছাত্ররাই একমাত্র দায়ী? তাহলে নকলের দায়ে শিক্ষক কেন বহিষ্কৃত হন। ঔপনিবেশিক আমলে অর্থাৎ যখন আমরা বৃটিশ শাসনের অধীন ছিলাম তখন দু'চার জন ছাত্র নকল করত। কিন্তু কোন শিক্ষক নকল করতে ছাত্রকে সাহায্য করছে, কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহল হাত লাগিয়েছে, এমন অভিযোগ কেউ কল্পনা করতে পারত না। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ, এ ধারণাটা আমাদের তৎকালীন শিক্ষকরা ছাত্রদের মনে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষকরা তখন শুধু চাকরিজীবী ছিলেন না। তারা ছিলেন মনোজ বসুর ভাষায় 'মানুষ গড়ার কারিগর'।

এখন শিক্ষক আছেন। তবে তারা মানুষ গড়ার কারিগরের ভূমিকা পালন করেন না। তারা এক ধরনের রাজনীতি করেন। তাকে ইচ্ছে হলে কেউ শিক্ষক রাজনীতি বলতে পারেন। এতে শিক্ষাদান কাজটা ততখানি ব্যাহত হয়, ঠিক যতখানি শিক্ষক রাজনীতি প্রাধান্য পায়। সেখানে কাজ করে খ্যাতি, যশ, সমাজে প্রতিষ্ঠা শিক্ষক হিসেবে নয়- অন্য পরিচয়ে। অথচ এদেশেই বহু শিক্ষক এমন প্রথিতযশা হয়ে আছেন যাদের কথা মাঝেমধ্যে পত্রিকার পাতায় উঠে আসে। এক একটি স্কুল এক একজন শিক্ষকের শিক্ষাদানের আন্তরিকতা, ছাত্রদের প্রতি ভালবাসার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষকরা গর্বিত ছিলেন। এ ধরনের স্মৃতিচারণায় কেউ কেউ নস্টালজিয়ার গন্ধ পান। সে কথা থাক।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করতে হ[illegible] ... সাধ[illegible] কোনো [illegible] ক্ষম পাস [illegible] হবে তাদে[র] আর্থিক নিরা[পত্তা] ... মর্যাদার জন্য ... অবশ্য শিক্ষক[দের] ... কিন্তু অর্থ উপার্জন ... অর্জন এক বস্তু নয়। ... মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীর ... গৌরব সঞ্চার করার ... শিক্ষকরা বলবেন আমরা ... করছি। না, তারা তা করছেন ... পোশাকটা ব্যবহার করছেন। ... স্বাদেশিকতা তাকে উপেক্ষা করা হ[য়] ... তাই দেখা গেল যে, শিক্ষকরা রাজ[নৈতিক] সমস্যা সম্পর্কে মতামত দেন। নিজেদের [বেতন] নিয়ে সরকারের সঙ্গে দরকষাকষি করেন, ভাতা নিয়ে আন্দোলন করেন। তা অবশ্যই কর[বেন]। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির নামে ছাত্রছাত্রী[দের] ভবিষ্যত যখন জলাঞ্জলি দেয়া হল, তারা প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন না। সঠিক পদ্ধতি গ্রহণের জন্য জোরগলায় কথা বললেন না। সবটা সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে তারা হাত ধুয়ে বসে রইলেন। যখন কিছু শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করল রাজপথে নামতে না শিখে জ্ঞানার্জনের সহজপথের বায়না আদায় করতে তখনও তারা রইলেন নিশ্চুপ কিংবা উদাসীন।

প্রতিবাদে তারা বলবেন, এ সত্য নয়। বলবেন, এতদিন পর যে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির কিছুটা সংশোধন হল, তাতে আমাদের অবদান আছে। সুতরাং অভিযোগ খারিজ। না, তারা বুকে হাত দিয়ে বলুন স্কুল কলেজে যদি ছাত্রদের পড়ানো হয় তবে ছাত্রের পিছনে প্রায় ডজনখানেক গৃহশিক্ষক কেন প্রয়োজন হয়? আর শুরুটা হয় গোড়া থেকেই অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকেই। গরীব ঘরের ছেলেরা এখন কদাচিৎ কোন পরীক্ষায় প্রথম দ্বিতীয় স্থান দখল করে কিংবা মেধা তালিকায় থাকে। তাদের মেধা কম বলে নয়, ক্লাসে শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ তারা পায় না বলে। ক্লাসে পড়াশুনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরবর্তী দিন কী পড়ে আসবে সেই নির্দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষক আছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে। তবে তা দিয়ে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র বিচার করা যায় না।

শিক্ষাক্ষেত্রে অপর দুটি সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত- যে সমস্যা দুটো আগে উল্লেখ করলাম। তার একটা হল সন্ত্রাস। যা শিক্ষা গ্রহণের পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। আর হল ইংরেজী শিক্ষাদানের বিরোধিতা যার লক্ষ্য [illegible] শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণী সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে [illegible] তার বাইরে নয়। সেই এক[illegible] ... শিক্ষানুরাগ, প্রকৃতি ও পরীক্ষা ... ভূমিকা।